ন্যাশনাল আইডি কার্ড : অভিজ্ঞতার আলোকে একটি প্রস্তাবনা

কাজী জহিরুল ইসলাম

সারাদেশে ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে। সম্ভব-অসম্ভবের দোলায় দুলছে বাংলাদেশ। এ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতার কথা উপস্থাপন করতে চাই। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে জাতিসংঘের ডাকে ছুটে গেলাম কসোভোতে। আমার দায়িত্ব হলো ১২ সদস্যের একটি টিমকে নেতৃত্ব দেয়া। যে টিমটি নির্দিষ্ট ৩টি এলাকার ভোটার ও সিভিল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। যাদের বয়স ১৬ বছর বা ততোধিক কেবলমাত্র তারাই এই রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসবেন। রেজিস্ট্রেশন শেষ হয়ে গেলে তারা সবাই একটি করে ন্যাশনাল আইডি কার্ড পাবেন। আইডি কার্ডে থাকবে ছবি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আইডি নম্বর, জন্মতারিখ এবং জন্মস্থান।

১১ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট এক ভূ-খন্ড কসোভো। যুগোস্লাভিয়ার সাবেক একটি প্রভিন্স। এখনো স্বাধীন দেশের মর্যাদা না পেলেও কসোভোর রয়েছে নিজস্ব সরকার, ভূ-খন্ড, পতাকা, জনগণ, শুধু নেই সার্বভৌমত্ব। স্বাধীনতার জন্য এই জাতি আন্দোলন করে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। পুরো কসোভো ৩০টি মিউনিসিপ্যালিটিতে বিভক্ত। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গড়ে এক একটি মিউনিসিপ্যালিটিতে ৫টি করে টিম গঠন করা হয়েছে। সেই হিসেবে পুরো কসোভোতে রেজিস্ট্রেশন টিমের সংখ্যা ১৫০টি।

প্রতিটি টিমের নেতৃত্বে আছেন একজন করে আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা। এ ছাড়া আঞ্চলিক সদর দফতরসমূহ এবং জাতীয় সদর দফতরে কাজ করছেন আরো প্রায় ২৫০জন আন্তর্জাতিক কর্মী। আমাদেরকে এক সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো। প্রশিক্ষণ গ্রহন করলাম মেসিডোনিয়ার এক সুন্দর পর্যটন শহর অখরিডে। জানানো হলো, কসোভোর অধিকাংশ স্থানেই বিদ্যুৎ নেই, নির্ধারিত কোন রেজিস্ট্রেশন সেন্টারও নেই। আমাদের ডেপ্লয়মেন্ট হয়ে গেলে নিজ নিজ এলাকায় ঘুরে ঘুরে উপযুক্ত একটি স্কুলঘর, রেকর্ড অফিস কিংবা কোন বিত্তশালী লোকের বৈঠকখানায় স্থাপন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন সেন্টার। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমটি পরিচালিত হবে অত্যধুনিক পদ্ধতিতে। এজন্য আমাদেরকে দেওয়া হলো একটি ল্যাপটপ, একটি ভিডিও ক্যামেরা, একটি বারকোড রিডার, একটি ইলেক্ট্রনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার, একটি জিপ ড্রাইভ আর একগাদা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম। যেহেতু অধিকাংশ রেজিস্ট্রেশন সেন্টারই হবে হয়ত কোন ভাঙা দালানের ভেতর, হয়ত দরোজা-জানলাহীন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কোন সরকারী রেকর্ড অফিসে, যেখানে বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই, টয়লেট নেই। তাহলে এই ল্যাপটপ, ভিডিও ক্যামেরা, ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার, বারকোড রিডার এইসব চালাবো কি করে? এজন্য আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হলো একটি করে পোর্টেবল জেনারেটর।

প্রশিক্ষণ শেষ করে ছুটলাম কসোভোতে। যথাসময়ে কাজ শুরু হলো। যেহেতু রেজিষ্ট্রেশন সেন্টারের দরোজা-জানালা নেই, কাজেই এতো মূল্যবান সব ইকুইপমেন্ট সেন্টারে রাখা যাবে না। রোজ সকালে সেন্টারে এসে ল্যাপটপে সংযোগ করি ক্যামেরা, ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারসহ যাবতীয় যন্ত্রপাতি। আবার সন্ধ্যায় সব খুলে একটি ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে যাই মিউনিসিপ্যাল সদর দফতরে। সারাদিন জেনারেটর চলে। আমরা একটানা কাজ করি আট ঘন্টা। এখনো যুদ্ধের রেশ লেগে আছে। আলবেনিয়ান-সার্বিয়ান দ্বন্দ্বের বলি, রোজই এখানে-সেখানে বাড়ি-ঘর উড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মাইন থ্রেট, বোম থ্রেটের কারণে আমাদেরকে

কাজ-কর্ম বন্ধও রাখতে হয়। ১২ জনের মধ্যে আমাকে বাদ দিলে বাকী ১১ জনের একজন আমার ভাষা সহকারী, একজন গাড়িচালক। বাকী নয়জনের দুইজনকে দায়িত্ব দিলাম কিউ কন্ট্রোলের। দুইজন অভ্যাগত রেজিস্ট্রেশনেচ্ছুদের ডকুমেন্ট পরীক্ষা করছে, চারজন রেজিস্ট্রেশন ফরম পুরণ করছে, আর একজন আমাকে সাহায্য করছে ছবি তোলা এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়ায়।

রেজিস্ট্রেশন ফরমের দুটি অংশ ছিল, উপরের অংশটিই মূল ফরম। সেখানে প্রার্থীর নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, জন্মস্থান লেখা হতো আর নিচের অংশটিতে থাকতো শুধু রেজিস্ট্রেশন ফরমের নম্বর ও প্রার্থীর নাম। এই অংশটি ছিঁড়ে প্রার্থীকে দিয়ে দেওয়া হতো তার রিসিট হিসেবে।

প্রথম কিছুদিন বিভিন্ন সেন্টার থেকে ঘন্টায় ঘন্টায় অভিযোগ আসতে লাগলো। ভিডিও ক্যামেরা কাজ করেতো ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার কাজ করে না। আবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার কাজ করেতো বারকোড রিডার কাজ করে না। আঞ্চলিক সদর দফতরে ছিল আইটি হেলপ ডেসক। ওয়াকি-টকিতে খবর পাওয়ামাত্র ওরা ছুটতো সেন্টারে সেন্টারে। এক পর্যায়ে আমাদের মনে হয়েছিল, এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এতো হাইটেক সিস্টেম কাজ করবে না। অচিরেই প্রকল্পটই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

এ ছাড়া আমরা আরো যেসব সমস্যা ফেইস করতাম তার মধ্যে অন্যতম হলো, ভূয়া প্রার্থী সনাক্তকরণ। আলবেনিয়া থেকে আসা প্রচুর অবৈধ অভিবাসী রেজিস্ট্রেশন করতে আসতো। ঠিক হলো, প্রার্থীকে কসোভার হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ হিসাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স, বাড়ি ভাড়ার রশিদ, বিদ্যুৎ বিল, শিক্ষাগত সনদ, পাসপোর্ট, এর যে কোন একটি দেখাতে হবে। যাদের কাছে এর কিছুই নেই, তাদেরকে নানান রকম প্রশ্ন করে বের করার চেষ্টা করতাম সে আসল কসোভার কি-না। গ্রামের অনেক নিরক্ষর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আসতেন, যারা নিজেদের জন্মতারিখ ঠিকমতো বলতে পারতেন না। বোমাতঙ্কসহ এইসব সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করেও আমরা ৭৫ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে সারা কসোভোর রেজিস্ট্রেশন কার্য শেষ করে ফেলি।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় অফিসে ফিরে এসে জিপ ড্রাইভে ধারণকৃত সারাদিনের তথ্যসংবলিত জিপ ডিস্কটি এবং পূরণ করা রেজিস্ট্রেশন ফরমগুলি একটি খামে ঢুকিয়ে, খামের ওপর লাল কালিতে সংখ্যা উল্লেখ করে জমা দিয়ে দিতাম ইলেকশন অফিসারের কাছে। তিনি সাথে সাথে তা পাঠিয়ে দিতেন আঞ্চলিক সদর দফতরে, সেখান থেকে চলে যেতো ডাটাবেইজ সচিবালয়ে। ওখানে প্রতিদিন সারা কসোভো থেকে আগত ডিস্কসমূহ নির্ধারিত সফটওয়ারে আপলোড করা হতো।

রেজিস্ট্রেশন শেষ হয়ে গেলে একদিন ঘোষণা করা হলো আইডি কার্ড এবং ট্রাভেল ডকুমেন্ট (পাসপোর্ট) দেওয়া হবে। প্রার্থীরা নিজ নিজ মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে গিয়ে ফরমের মুড়িটি দেখিয়ে ছবি এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট সংবলিত লেমিনেটেড ন্যাশনাল আইডি কার্ড এবং পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে শুরু করলো।

কসোভোর মোট ১০ লক্ষ লোকের রেজিস্ট্রেশন করি আমরা। বাংলাদেশে লোকের সংখ্যা (ষোলোর্ধ) হয়ত ১০ কোটি হবে। এই ১০০ গুণ অধিক লোকের রেজিস্ট্রেশন করতে ১০০ গুণ বেশি সময় লাগবে, এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। বরং ১০০ গুণ অধিক কর্মী নিয়োগ করতে হবে। ওখানে টিমের সংখ্যা ছিল ১৫০টি, এখানে টিমের সংখ্যা হবে ১৫ হাজারটি। একটি উপযুক্ত সফটওয়ার তৈরী করতে হবে। যারা সফটওয়ারটি তৈরী করবেন তারা এসে ৬৪টি জেলার জন্য নির্বাচিত ৬৪ জনসহ

অতিরিক্ত আরো ৬৪ জনকে টিওটি (ট্রেইনিং অব ট্রেইনার্স) দেবেন। এখানে বলে রাখি কসোভোতে ব্যবহৃত SEGAM নামের সফটওয়ারটি তৈরী করে ভারতীয় কোম্পানী। আমার ধারণা এখন বাংলাদেশে এমন এক্সপার্ট আছেন যারা এমন একটি সহজ সফটওয়ার তৈরী করতে পারবেন। সেইসব ট্রেইনাররা থানা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম বা ওয়ার্ড পর্যায়ের টিমসমূহকে প্রশিক্ষণ দেবেন। চার ধাপে প্রশিক্ষণটি সারা দেশব্যাপী একযোগে আয়োজন করলে সর্বমোট সময় লাগবে ৪ সপ্তাহ। প্রশিক্ষণের পরপরই আমরা কাজে লেগে যাবো। প্রতিটি গ্রামের বা ওয়ার্ডের স্কুলে রেজিস্ট্রেশন সেন্টার খোলা হবে। তিন মাসের জন্য টিম ওই গ্রাম বা ওয়ার্ডেই অবস্থান করবে। শুধু প্রতিদিনের জিপ ডিস্ক এবং রেজিস্ট্রেশন ফরমসমূহ থানা সদর দফতরে পাঠিয়ে দেবে। ওখান থেকে জেলা সদর দফতরে চলে আসবে। প্রতিটি জেলা সদর দফতরে আমরা ডাটা প্রসেসিং সেন্টার খুলতে পারি, এখানেই পরবর্তিতে ন্যাশনাল আইডি কার্ড প্রিন্ট হবে।

প্রতিটি টিমের জন্য যদি ২ লক্ষ টাকার ইকুইপমেন্ট লাগে তাহলে মোট ইকুইপমেন্ট লাগবে ৩০০ কোটি টাকার। আইডি প্রিন্টার এবং ডাটা প্রসেসিং সেন্টারসমূহের ইকুইপমেন্টের জন্য লাগবে আরো ৫ কোটি টাকা। আইডি কার্ডের জন্য লাগবে ৫০০ কোটি টাকা। কর্মীদের বেতন-ফি বাবদ লাগবে আরো ২০০ কোটি টাকা। সর্বমোট এই খাতে ব্যায় হবে ১ হাজার কোটি টাকা (১৪৩ মিলিয়ন ডলার)। স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ন্যাশনাল আইডি ডিপার্টমেন্ট হবে। এই ডিপার্টমেন্ট সম্পূর্ণ কাজটি করবে এবং এসব তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রতিটি থানা, পাসপোর্ট অফিস, ইমিগ্রেশন বিভাগ, ট্যাক্স অফিস, এমন কি মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পুলিশের টহল গাড়িগুলোতেও থাকতে পারে। বিভিন্ন ব্যাংকসমূহকেও এই ডাটাব্যংকে এক্সেস দেওয়া যেতে পারে।

আমিতো মনে করি এই সম্পূর্ণ কাজটি ৯ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে করা সম্ভর। এখানেই আমরা থেমে থাকবো না। এরপর থানা পর্যায়ে আইডি ডিপার্টমেন্টের অফিসসমূহ থেকে যাবে, বাংলাদেশের নাগরিকদের রেজিস্ট্রেশন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে আসবে। এরপর আমরা ষোল বছরের নিচে যারা আছে, রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসেনি, তাদের রেজিস্ট্রেশন শুরু করবো। তারপর একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে প্রতিটি নবজাতকের নাম রেজিস্ট্রি হবে ন্যাশনাল আইডি ডিপার্টমেন্টের থানা অফিসগুলোতে।

একবার এই কাজটি করে ফেলতে পারলে আর আমাদের পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। ভূয়া ভোটদানসহ তৃণমূল পর্যায়ের অনেক দূর্নীতি কমিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। বর্তমান নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখতে পারেন। কতো হাজার হাজার কোটি টাকা আমরা কতোভাবে খরচ করছি, মাত্র এক হাজার কোটি টাকা এই কাজের জন্য জোগাড় করতে পারবো না? প্রয়োজনে ডোনার ফান্ড আহবান করা যেতে পারে। আমরা একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আকারে বিষয়টি তৈরী করে জাতিসংঘের সাহায্যও চাইতে পারি।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৯ জানুয়ারী, ২০০৭